বিষয় উপস্থাপনাঃ গৌতম সরকার,
সহঃকারী অধ্যাপক,
ইতিহাস বিভাগ,
এস, আর, ফতেপুরিয়া কলেজ,
বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।

জৈনধর্ম

বিষয় সংক্ষেপ ঃ প্রচলিত ধর্মমতের পরিধির বাইরে বুদ্ধের সমসাময়িক যে সব চিন্তানায়ক গুরু ছিলেন বর্ধমান তাঁদের একজন। তাঁর অনুবর্তীদের কাছে তিনি মহাবীর নামেও পরিচিত। জৈন ধর্ম বলতে বোঝায় বিজয়ীদের ধর্ম। মহাবীর এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। এই ধর্মের ইতিহাস বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস থেকে অনেকটাই পৃথক। ভারতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল এই ধর্ম এবং দেশের কোথাও কোথাও যে খুবই প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল এতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতের বাইরে এর প্রসার কখনও ঘটেনি। বৌদ্ধধর্মের যেমন নানারকম মৌলিক পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটেছে বহুদিন ধরে তেমন কিন্তু ঘটেনি জৈন ধর্মের ক্ষেত্রে। জৈন ধর্মের ইতিহাস বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের মতো কৌতুহলদ্দীপক নয় এবং তা বৌদ্ধধর্মের মতো গুরুত্বপূর্ণও কোনোদিন হতে পারেনি। তবু কিন্তু জৈনধর্ম ভারতে আজও টিকে আছে। জৈনদের সংখ্যা এ দেশে কুড়ি লক্ষের কম নয়। বেশির ভাগই তাঁরা বিত্তবান বণিক শ্রেণীর মানুষ।

মূলবিষয় ঃ- প্রাচীন ভারতে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ট শতক ছিল ধর্মমত ও দর্শনশাস্ত্রের ব্যাপারে অনুসন্ধানের ও সংস্কার সাধনের যুগ। ধর্মমত হিসাবে বেদের প্রভাব তখন কিছুটা কমে এসেছিল। বেদগুলির পৌরাণিক ধ্যান-ধারণা, পুরোহিতদের দাবি-দাওয়া কোনকিছুই আর নতুন আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারছিল না। ফলে প্রতিবাদ জোরদার হয়ে ওঠে। উপনিষদগুলিতে এর ইঙ্গিত মেলে। উপনিষদ এবং ষড়দর্শন অবশ্য বেদকে অগ্রাহ্য করেনি, তবে বেদকে নতুন শক্তি যোগাতে সাহায্য করে। প্রাচীনপন্থীরা অবশ্য নতুন ধর্মমতগুলিকে সনাতন ধর্মবিরুদ্ধ বলে আখ্যা দেন। এই নতুন ধর্মমতগুলির অন্যতম হল জৈন ধর্ম।

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ট শতকের পূর্বেই উত্তর ভারতে কয়েকটি গণরাজ্যের উদ্ভব ঘটে। এইসব রাজ্যের শাসন উপজাতিদের সমিতি দ্বারা পরিচালিত হত। প্রতি গ্রামে ছিল জনসাধারণের নির্বাচিত সমিতি। বৃজি, মল্ল প্রভৃতি সংঘরাজ্য ছিল কয়েকটি – স্বাধীন ও সম-অধিকারসম্পন্ন উপজাতির মিলিত গণরাজ্য। এরূপ গণরাজ্যে প্রত্যেক রাজ্যের বা উপজাতির স্বাতন্ত্র্য অটুট থাকত। সুতরাং গণরাজ্যে রাজার ঐশ্বরিক ক্ষমতা, পুরোহিতদের শক্তি ও বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বিশেষ ছিল না। এসব রাজ্যে ব্রাহ্মণদের চেয়ে ক্ষত্রিয়দের মর্যাদা ছিল বেশি। কৃষিকার্য ও পশুপালন ছিল এসব রাজ্যের অর্থাগমের প্রধান পথ। অবশ্য এসব রাজ্যে কয়েকটি শহরের উদ্ভব ঘটে এবং সেগুলি শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। স্বভাবতই এই শহর বা নগরগুলি গণরাজ্যের অধিবাসীদের জীবনে প্রভাব ফেলেছিল। গণরাজ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা রাজতন্ত্র-শাসিত রাজ্যের চেয়ে অধিক ছিল। প্রচলিত মতের বিরোধীদেরও সহ্য করা হত।

এরূপ গণরাজ্য থেকেই জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ঘটে। জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর ছিলেন জ্ঞাতৃক উপজাতির অন্তর্ভুক্ত।

জৈনদের মধ্যে কিংবদন্তী অনুসারে চব্বিশজন তীর্থঙ্কর বা মহাপুরুষ এই ধর্ম প্রবর্তন করেন। এদের মধ্যে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভ এবং শেষ দুজন হলেন যথাক্রমে পার্শ্বনাথ ও মহাবীর। কেউ কেউ মনে করেন পার্শ্বনাথই জৈন ধর্মের প্রবর্তক। আবার কারও কারও মতে মহাবীরই জৈন ধর্মকে বাস্তব রূপ দেন। রমিলা থাপারের মতে জৈন ধ্যান-ধারণার প্রচার চলছিল খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকেই। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীতে মহাবীর সেগুলিকে একটা স্পষ্ট রূপ দেন। জৈন শব্দটি এসেছে ' জিন ' শব্দ থেকে, অর্থাৎ ' বিজেতা'। এখানে বিজেতা মানে মহাবীর।

মহাবীর বাল্যকালে বর্ধমান নামে পরিচিত ছিলেন। উত্তর বিহারের অন্তর্গত জ্ঞাতৃক নামক ক্ষত্রিয়কুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সিদ্ধার্থ ছিলেন ঐ কুলের ক্ষত্রিয় নায়ক। মাতা ত্রিশলা ছিলেন বৈশালীর রাজ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিতা। সম্ভবত তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ছিলেন গৌতম বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক।

মহাবীর যশোদা নামে এক কন্যাকে বিবাহ করেন এবং সংসারের প্রতি অনাসক্তি তাঁকে সংসার ত্যাগে বাধ্য করে (৫১০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে)। গৃহত্যাগ করে সুদীর্ঘ তের বছর ধরে তপশ্চর্যার পর ' কৈবল্য ' অর্থাৎ চরম জ্ঞান লাভ করেন। তিনি সিদ্ধিলাভের পর ' জিন ' (রিপুজয়) বা বিজেতা নামে পরিচিত হন। তিনি নির্গ্রন্থ বা মুক্ত নামে এক ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর প্রচারিত ধর্ম ' নির্গ্রন্থ ' বা জৈন ধর্ম নামে পরিচিত। প্রায় ত্রিশ বছর ধরে ধর্ম প্রচারের পর বাহাত্তর বছর বয়সে দক্ষিণ বিহারের পাবা নামক শহরে তিনি দেহত্যাগ করেন। জৈন মতে এ ঘটনাটি ঘটে খ্রিষ্টপূর্ব ৫২৭-২৮ অব্দে, আধুনিক মতে ৪৬৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। এ থেকে মনে হয় মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ সমসাময়িক ছিলেন।

জৈনধর্মের অন্যতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ তাঁর শিষ্যদের চতুর্যাম বা চারটি বিষয়ে সংযম সাধনার উপদেশ দেন। এই চতুর্যাম হল----হিংসা না করা, মিথ্যা কথা না বলা, চুরি না করা এবং কোন কিছুতে আসক্ত না হওয়া। মাহাবীর এই চতুর্যামে আর একটি নির্দেশ যোগ দেন---ইন্দ্রিয়কে জয় করা। জৈন ধর্মের মধ্যে আবার ত্রিরত্নের সন্ধান পাওয়া যায়—যথার্থ বিশ্বাস, যথার্থ জ্ঞান এবং যথার্থ কাজ। এগুলির দ্বারা পার্থিব বন্ধন মোচন সহজ ও সম্ভব হয়। সংসারের বন্ধন থেকে মানবত্মার মুক্তিই ছিল মহাবীরের উদ্দেশ্য তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের নাম ' নির্গ্রন্থ ' বা ' বন্ধনহীন '। মহাবীর বসন-ভুষণকেও বন্ধন বলে মনে করতেন এবং জড় পদার্থে আত্মার অবস্থিতি স্বীকার করতেন। জৈনধর্মে অহিংসা একটি সুউচ্চ স্থান অধিকার করেছে। অহিংসা মুক্তি বা ' সিদ্ধশীলা ' লাভের প্রধান উপায়।

মহাবীরের উপদেশের প্রচার গাঙ্গেয় সমভূমিতেই প্রথমে সীমিত ছিল। পরে পশ্চিমাঞ্চলে জৈন ধর্মের প্রসার ঘটে। এছাড়া উত্তর ভারতের কিছু অংশে ও দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্যে এই ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। গুজরাট ও রাজস্থানে এখনো ২০ লক্ষের অধিক জৈন ধর্মাবলম্বী আছেন।

মহাবীর স্বরচিত কোন ধর্মগ্রন্থ রেখে যাননি। অর্থাৎ তাঁর উপদেশাবলী প্রথমদিকে মৌখিক পদ্ধতিতেই সংরক্ষিত ছিল। তাঁর শিষ্যরা তাঁর উপদেশ সংকলন করেছিলেন। এই সংকলনই জৈন ধর্মশাস্ত্র। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে জৈনরা দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। ধর্ম বিষয়ে এদের মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য দেখা যায় না। তবে এদের একদল শ্বেতবস্ত্র পরতে শুরু করে। তাঁরা ' শ্বেতাম্বর ' নামে অভিহিত হয়। আর যারা নগ্ন দেহে রয়ে গেল তাঁদের বলা হয় ' দিগম্বর '। শ্বেতাম্বর শাখার জনশ্রুতি অনুশারে মহাবীরের উপদেশ '

পূর্ব ' নামে চৌদ্দটি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। জৈন আচার্য ভদ্রবাহু সদলবলে দাক্ষিণাত্যে চলে গেলে উত্তর ভারতের জৈনরা একটি মহাসভা ডেকে জৈন ধর্মশাস্ত্রকে একটি সুস্পষ্ট আকার দেবার চেষ্টা করেন। এর ফলে বারটি 'অঙ্গ' নামে গ্রন্থে জৈন ধর্মের তত্বগুলি সন্নিবেস্টিত হয়। পরবর্তীকালে অঙ্গ-এর সঙ্গে ' উপাঙ্গ ' ' মুলসুত্র ' প্রভৃতি গ্রন্থের সংযোগ ঘটে। ভদ্রবাহুর অনুগামীরা কিন্তু এগুলি স্বীকার করেনি। অতএব অঙ্গ, উপাঙ্গ ও মুলসুত্র জৈনদের দিগম্বর শাখার ধর্মগ্রন্থ হিসাবে থেকে যায়।

জৈনরা মুলত অহিংসা পালন করেন। বৈদিক যাগযজ্ঞের আনুষ্ঠানিকতায় তাঁরা বিশ্বাস করেন না। জৈনদের মতে মানুষ নিজ কর্মফলের জন্যই পুনর্জন্ম লাভ করে। এই পুনরজন্মএর হাত থেকে মুক্তির উপায় কঠোর ব্রত পালন ও কৃচ্ছসাধন। জৈনরা জাতিভেদ মানেন না। ফলে অসংখ্য গৃহী মহাবীরের ধর্ম গ্রহণ করে। এই গৃহী শিষ্যদের বিষয়সম্পত্তি বা পরিবার-পরিজন ত্যাগ করতে হয়নি, তবে তাঁদের জৈন ধর্মের বিধিবদ্ধ সুনির্দিষ্ট আচার-অনুস্টান মেনে চলতে হত। জোই ধর্মে বস্তুজগৎ ও আত্মিক জগতকে দুটি পৃথক শক্তি হিসাবে দেখান হয়নি। মানুষের অনুভব ও চিন্তার ক্ষমতা যেমন স্বাভাবিক তেমনই প্রকৃতি জগতে একই প্রকারের শক্তি কাজ করছে। এর ফলে জৈনদের নিকট বস্তুজগৎ ও আত্মিক জগতের মধ্যে পার্থক্য নেই। ফলে সব জিনিসে আত্মা বর্তমান বলে তাঁরা মনে করে। গাছপালা, ইট, পাথর সব জিনিসেরই আত্মা আছে। আত্মা অবিনাশী, কিন্তু ইশ্বর তা সৃষ্টি করেননি।

উপনিষদে যেসব ধ্যানধারণার কথা আছে জৈনরা সেগুলি গ্রহণ করেছিল। তাঁরা পুনর্জন্মবাদে এবং কৃতকর্মের ফল অনুযায়ী নতুন জন্মলাভের যে তত্ত্ব সেই কর্মবাদে চরম বিশ্বাস রাখে।

সব বস্তুরই প্রান আছে জৈনধর্মের এই তত্ত্ব ও পুনর্জন্মবাদের ধারনার সুষম সমন্বয় ঘটায় নানারকম প্রাণী ও বস্তুর মধ্যে পার্থক্য বলে আর কিছু রইল না। জৈনদের নিকট মানুষ পরজন্মে ইট, পাথর হতে পারে , আবার পরজন্মে মানুষ হতে পারে। আত্মার আধার কি হবে কর্মবাদই তা ঠিক করে দেয়।

জৈনধর্মের মূল লক্ষ্য ছিল পরম জ্ঞান অর্জন, মানুষকে সাহায্য করা নয়, বরঞ্চ এমন সব নিয়ম-নীতি বা বিধি-বিধান ঠিক করে দেওয়া যা মানুষকে বাস্তব জীবনে তাঁর ধর্মীয় আদর্শে পৌঁছাইতে সাহায্য করবে। উপনিষদগুলির মতো জৈনধর্মের আদর্শ হল পরম মুক্তি। এর অর্থ হল সব কামনা-বাসনা ও ঐহিক বন্ধনের হাত এড়িয়ে এমন একটা অবস্থায় পৌছান যে অবস্থায় ব্যক্তিসত্তা বিলীন হয়ে যাবে এক পরমসত্তায়। ব্যক্তি-মানুষ যখন এরূপ অবস্থায় পৌঁছায় তখন সে এমন এক অনির্বচনীয় অবস্থায় থাকে যে অবস্থায় দেবতাও পৌঁছাতে পারেন না। কারণ দেবতারা হলেন কর্মবাদের অধীন। যেসব জৈন সন্ন্যাসী এই অবস্থায় পৌঁছান বা ' পরমা মুক্তি ' পান, তাঁরা দেবতাদেরও ওপরে। পূর্ণ মুক্তি অর্জন একমাত্র মানুষ করতে পারে। দেবতাদের এই মুক্তি পেতে হলে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হবে। মুক্তির পথ কঠিন পথ। তপশ্চর্যা , সর্বত্যাগ ও আত্মপীড়ন হল এর মাধ্যম।

জৈনধর্ম অনুযায়ী গৃহীর পক্ষে পরম মুক্তি সম্ভব নয়। একমাত্র সন্ন্যাসীর আত্মাই মুক্তি পেতে পারে। জৈন নীতিকথার এক অপরিহার্য অঙ্গ হল অহিংসা। জৈন সাধুরা কেবলমাত্র প্রাণীহত্যা থেকেই বিরত থাকতেন না, ছোট ছোট পোকামাকড়ও যাতে কোনভাবে মরে না যায় তাঁর জন্য তাঁরা খুবই সতর্ক থাকতেন। এর জন্য জৈনশাস্ত্রে সন্ন্যাসীদের জন্য ২৮ টি আচারণবিধি বেঁধে দেওয়া হয়। এগুলির মধ্যে রয়েছে সত্যকথা বলা, সংযম, বৈরাগ্য, চুরি না করা ইত্যাদি। তবে জৈনধর্মের গৃহী শিষ্যদের জন্য বিধিনিষেধের কঠোরতা এতো বেশি ছিল না।

জৈনধর্মের কঠোর নিয়মকানুন কৃষিজীবীদের পক্ষে অনুসরন করা অসম্ভব ছিল বলে তাঁরা এই ধর্ম গ্রহনে দ্বিধাবোধ করেছিল। এর কারণ হল অহিংসার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া। চাষের সময় কীটপতঙ্গ মারা যেতে পারে। অতএব যে পেশায় প্রাণীহত্যার সম্ভাবনা থাকতো, সে সব পেশায় লিপ্ত ব্যক্তিদের পক্ষে এ ধর্ম গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাছাড়া জৈনধর্ম মিতব্যয়িতার ওপর জোর দিয়েছে, কিন্তু সম্পত্তির পরিমাণ সম্বন্ধে কিছু বলেনি। এ-দুটি বিষয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোকজন অধিক সংখ্যায় জৈনধর্ম গ্রহণ করায় শহরগুলির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে কারণ ব্যবসায়ী তথা বণিক সম্প্রদায়ের কাজকর্ম বিশেষ করে শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ কারণে জৈনধর্মের সঙ্গে শহর- সংস্কৃতির একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পশ্চিম ভারতে সামুদ্রিক বাণিজ্যের সুযোগ থাকায় ঐ অঞ্চলে জৈনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

জৈনধর্ম বর্ণাশ্রম প্রথা ও বৈদিক আচার- অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধাচরণ করে। এই ধর্ম প্রথমদিকে সংস্কৃত ভাষার বিরুদ্ধে ছিল এবং সাধারণ মানুষের ভাষায় ধর্ম বা নীতিকথাগুলি প্রচার করেছিল। ধর্মপুস্তকগুলি জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় লেখা হয়। জৈনশাস্ত্র অর্ধ- মাগধী ভাষায় লিখিত। গুজরাটের বল্লভীতে জৈনরা এক বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে। এই শিক্ষাকেন্দ্রে অন্যান্য ধর্ম অবলম্বীগণও শিক্ষা লাভ করতে পারত। প্রাকৃত ভাষা হল বহু ভাষার উৎসস্থল। উদাহরণ হিসাবে শৌরসেনি, মাগধী ইত্যাদি ভাষার উল্লেখ করা যায়। এমনকি দাক্ষিণাত্যের কানাড়ি ভাষার উৎকর্ষ সাধনে জৈনদের অবদান কম নয়। এই ভাষায় তাঁরা বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। সংস্কৃত ভাষাতেও জৈন সন্ন্যাসীদের বহু গ্রন্থ রয়েছে। টীকাকার মল্লিনাথও ছিলেন জৈনসম্প্রদায়ভুক্ত। জৈনরা যে কোন বিষয়ের পুঁথি নকল করাকে পুণ্য কাজ বলে মনে করত। এ কারনে পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন জৈন কেন্দ্রগুলিতে অসংখ্য জৈন ও অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থাদি পাওয়া যায়। শিল্পের ক্ষেত্রে জৈনদের অবদান চিরস্বরণীয়। মাউন্ট আবুতে অবস্থিত অপূর্ব জৈন মন্দিরটি এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইলোরাতে উদয়গিরি (ব্যাঘ্র) গুহাটি আর একটি অপূর্ব জৈন শিল্প নিদর্শন। এছাড়া চিতোরের আদিনাথ মন্দির, মহীশুরের নিকট শ্রবনবেলগোলায় জৈন আশ্রম তথা গোমতেশ্বরের মূর্তিটি আজও বিশ্ময় সৃষ্টি করে। উড়িষ্যার হাতিগুম্ফা গুহাটি জৈনদের অবদান।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিবাদে জৈনধর্মের উৎপত্তি হলেও এটি পরিপূর্ণভাবে বেদ-বিরোধী আন্দোলন বলে মনে করা যায় না। বরঞ্চ এটিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একটি শাখা হিসাবেই গণ্য করা উচিৎ। বৈদিক দর্শন ও ধ্যানধারণার ওপর এটি প্রতিষ্ঠিত। জৈন দর্শনকে বস্তুবাদী দর্শন হিসাবে চিহ্নিত করলেও এই দর্শনের ভিত্তিভূমি হল উপনিষদ। জৈনধর্মের কর্মবাদ, আত্মার দেহান্তরবাদ, অহিংসাবাদ উপনিষদ থেকেই নেওয়া। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবদেবীরা জৈনদের নিকটও উপাস্য দেবদেবী। পূজাঅর্চনার ক্ষেত্রে জৈনরা এখনো ব্রাহ্মণদের ওপরেই নির্ভর করেন। পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে জৈনধর্মকে ধর্ম বা religion না বলে নৈতিক আচারণবিধি বলাই যুক্তিসঙ্গত। এখন পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্ম বলতে কি বোঝায় আমাদের জানতে হবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি এবং তাঁর উপসনাকে যদি আমরা ধর্ম বলে মানি তা হলে এই মাপকাঠিতে জৈনধর্ম ঠিক ধর্ম নয়। আর ধর্মের মধ্যে যদি আমরা সৎ আচারণগুলিও অন্তর্ভুক্ত করি তাহলে জৈনধর্মের নীতিগুলির ওপর নির্ভর করে এঁকে ধর্ম বলা যায়।

মহাবীর কোন নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেননি। তিনি পার্শ্বনাথ প্রবর্তিত ধর্মের বাণীতে কিছু সংযোগ ঘটিয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু সাধারণত আমরা জানি মহাবীরই ছিলেন জৈনধর্মের প্রবর্তক এবং বৌদ্ধশাস্ত্রেও অনুরূপ কথাই বলা হয়েছে।

ঈশ্বরের অবস্থিতি মেনে নেওয়া ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু জৈনধর্ম পুরোপুরিভাবে নিরীশ্বরবাদী। ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে বা নেই সে নিয়ে জৈন ধর্ম মাথা ঘামায়নি। এ কারণে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তা হিসাবে ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হয়েছে। তাঁর বদলে সর্বজনীন বিধানকে এই বিশ্বের নিয়ন্তা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মহাপ্রলয়ের ধারণাও এরা স্বীকার করেন। জৈনদের মতে জীবন এবং অজীবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই বিশ্ব চলছে।

জৈনরা দুটি শাখায় বিভক্ত। ধরমবিষয়ে বা তত্ত্বের দিক থেকে এদের মধ্যে বিশেষ পারথক্য নেই, পার্থক্য আছে কয়েকটি বিষয়ে বা নৈতিক বিধিতে। শ্বেতাম্বর বা সাদা পোষাকধারীরা এ ব্যাপারে কিছুটা নরমপন্থী, কিন্তু দিগম্বরীরা এ ব্যাপারে খুবই গোঁড়া। নৈতিক বিধিনিষেধগুলির মধ্যে দিগম্বরগণ বিশেষ করে যিনি সাধুসন্ত তাঁর ক্ষুতপিপাসা থাকবে না, কারণ তিনি চরম জ্ঞান অর্জন করেছেন। শ্বেতাম্বরীরা এটা বিশ্বাস করে না। দিগম্বরীরা মনে করে, যে সাধুর ধনসম্পত্তি আছে এবং বস্ত্র পরিধান করে তাঁর পক্ষে মুক্তি অর্জন করা বা সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নারী কখনো মুক্তি পেতে পারে না, মুক্তি পেতে হলে তাঁকে পুরুষ হয়ে জন্মাতে হবে। শ্বেতাম্বরগণ এটা বিশ্বাস করে না। কঠোর তপশ্চর্যা উভয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীর পক্ষে আবশ্যিক। দিনে তিন ঘণ্টার বেশি নিদ্রা নিষেধ। বাকী সময়টা পাপস্খলনের জন্য অবিরত উপাসনা ও ধ্যানে কাটাতে হবে। জীব হত্যা মহাপাপ বলে মনে করতে হবে। এমনকি পোকামাকড়ও মারা চলবে না।

জৈনধর্মে ঈশ্বরের বা ইশ্বর-প্রেরিত পুরুষের কোন স্থান নেই। তেমনই এই ধর্ম প্রচার করবার জন্য বৌদ্ধসঙ্ঘ বা খ্রিষ্টান চার্চের মতো কোন সংস্থা গড়ে ওঠেনি। তবে সাধুসন্তদের শ্রদ্ধা করা ও সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের এই ধর্মমতে বিশেষ স্থান আছে। জৈনধর্মের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বোধগম্য বাস্তববাদ ও বহুত্ববাদের সংমিশ্রনে গড়ে ওঠে। জীব (আত্মা) এবং অজীব (বস্তু) এ দুটি শব্দকে জৈনধর্মের বুনিয়াদ বলা হয়। জীব হল আধ্যাত্মিক এবং অজীব বাস্তব। কিন্তু এ দুটির মধ্যে সীমারেখা নেই। জৈনধর্মের জীব ও অজীবের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই এই বিশ্ব চলছে। জীব কেবলমাত্র প্রাণীজগতেই নেই, অপ্রাণীজগতেও আছে। জীবের সংখ্যা অনন্ত। বস্তুর দ্বারাই পাপ ভিন্ন হয়ে যায়। এই বস্তু হল কর্ম। মানুষের জীবনে কর্মের শেষ নেই। একটার পর একটা কর্ম এসে যায়। এর মধ্যে জন্মেরও শেষ নেই। কর্ম থেকে পরিত্রাণ পেলেই মুক্তি। এই নীতিজ্ঞান পাওয়া খুবই দুঃসাধ্য। পবিত্রতা অর্জন করতে পারলে এটা সম্ভব। সংযত জীবনযাপন ও কঠোর তপস্যা না করতে পারলে এটা অর্জন করা যায় না। জীব যখন বন্ধনমুক্ত হয় তখন তাঁর স্থান দেবতাদেরও ওপরে। অতএব জৈনদের সাধনা হল ত্যাগ ও পবিত্রতার সাধনা। এখানে ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠানের কথা নেই, মন্ত্রের স্থান নেই, ইষ্ট দেবতার কথা নেই। অতএব ধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি জৈনধর্মে তা লক্ষ্য করা যায় না। জৈনধর্মে কেবলমাত্র সাধুদের আচারনবিধি বলা আছে। এ কারনেই জৈনধর্মকে ধর্ম না বলে নৈতিক আচারনবিধি বা নৈতিক সংহিতা বলা হয়। এ সত্বেও আমরা মনে করি জৈনধর্ম একটি ধর্ম। এখনো ভারতে প্রায় ৩ কোটি লোক এই ধর্মে বিশ্বাসী।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ-

1) Genesis of Buddhism-Its Social Content- B.N.Mukherjee.

2) Political History of Ancient India-H.C.Raychowdhury.

3) Religions of Ancient India- L. Renou.

4) The Religion and Philosophy of the Vedas and Uponisads- A. B. Keith.

৫) অতীতের উজ্জ্বল ভারত- এ, এল, ব্যাসাম।

৬) প্রাচীন ভারতের ইতিহাস(প্রথম খণ্ড)- সুনীল চট্টোপাধ্যায়।

৭) ভারতবর্ষের ইতিহাস- রোমিলা থাপার।

সম্ভাব্য প্রশ্নমালাঃ-

১) জৈন কাদের বলা হয় ? (২)

২) জৈনদের ২৩ তম ও সর্বশেষ বা ২৪ তম ' তীর্থঙ্কর ' এর নাম কি ? (২)

৩) চতুর্যাম কাকে বলে ? (২) (৫)

৪) ' ত্রি-রত্ন' কি ? (২)

৫) জৈনদের দুটি সম্প্রদায় কি কি ? (২)

৬) জৈনদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি ? (২)

৭) দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর কাদের বলা হয় ? (৫)

৮) জৈনধর্মের মুলনীতিগুলি কি ? (৫)

৯) জৈনধর্ম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে মিল ও অমিল কোথায় ? (৫)

১০) জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে মিল ও অমিল কি কি ? (৫)

১১) ভারতীয় সমাজ জীবনে জৈনধর্মের প্রভাব কি ? (৫)

১২) জৈন দর্শন সম্পর্কে আলোচনা কর ? (১০)